

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইমাম আবু হানীফা ও আল-ফিকহুল আকবর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১৫. ৪. পরবর্তী যুগের হানাফী ফকীহগণ

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম আবু হানীফা তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদেরকে নির্বিচার তাকলীদ থেকে মুক্ত হয়ে দলীলভিত্তিক তাকলীদ, দলীল অনুসন্ধান ও দলীল অনুসরণের জন্য তাকীদ দিয়েছেন। বাস্তবে আমরা দেখি যে, ইমামের মতের বিপরীতে ভিন্নমত পোষণ করার প্রবণতা হানাফী মাযহাবের মধ্যে যেভাবে আছে অন্য কোনো মাযহাবে সেরূপ নেই। মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে ইমামের মতের বিপরীত কোনো মত মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত নেই। ইমামের একাধিক মতের মধ্যে একটি গ্রহণের বিষয়ে এবং যে বিষয়ে ইমামের মত নেই সে বিষয়ে এ সকল মাযহাবের আলিমগণ ইজতিহাদ করেছেন। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের প্রথম কয়েক প্রজন্মের আলিমগণ ইমামের মতের বিপরীতে মত প্রকাশ করেছেন এবং এরূপ ভিন্নমতকে মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ ইমাম নিজেই তাঁদেরকে এরূপ স্বাধীন ইজতিহাদ ও দলীল নির্ভরতা শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁরা দলিলভিত্তিক তাকলীদ সমর্থন করেছেন, দলীল না জেনে ইমামের মতানুসারে ফাতওয়া প্রদান অবৈধ বলেছেন এবং সহীহ হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করাও তাকলীদের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু ইউসূফ, ইমাম যুফার ও অন্যান্য ফকীহের প্রসিদ্ধ ছাত্র, হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম ইসাম ইবন ইউসূফ ইবন মাইমুন বালখী (২১৫ হি)। তিনি বলেন:

كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه زفر وأبو يوسف وعافية وآخر فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا

“আমি একটি জমায়েতে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর চার সাথী উপস্থিত ছিলেন: যুফার, আবু ইউসূফ, আফিয়া ও অন্য একজন, তাঁরা সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন যে, আমরা আমাদের বক্তব্য কোন্ দলিল থেকে গ্রহণ করেছি সে দলিল না জানা পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয়।”[1]

ইমামের মতের বিপরীতে দলীল পাওয়া গেলে তা অনুসরণ করার বিষয়ে ইমাম আযমের নির্দেশ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন আবিদীন বলেন:

وَكَانَ كَذَلِكَ، فَحَصَلَ الْمُخَالَفَةُ مِنَ الصَّاحِبَيْنِ فِي نَحْوِ ثُلُثِ الْمَذْهَبِ

“ইমামের এ কথার ভিত্তিতে তাঁর ছাত্রগণ এভাবেই চলতেন, একারণে ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ

মাযহাবের প্রায় তিনভাগের একভাগ মাসআলাতে ইমাম আযমের বিরোধিতা করেছেন।”[2]

ইমাম ইসাম ইবন ইউসুফের সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ, যুফার ও অন্যদের বক্তব্য উপরে উদ্ধৃত করেছি। ইমাম ইসাম অনেক মাসআলাতে ইমাম আবু হানীফার মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। তাঁকে এ বিষয়ে আপত্তি করা হলে তিনি বলেন:

لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت ، فأدرك بفهمه ما لم ندركه، ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم

“ইমাম আবু হানীফার সাথে আমাদের মতপার্থক্য হওয়ার কারণ আবু হানীফা এমন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যা আমরা অর্জন করতে পারি নি। তিনি তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দিয়ে যা বুঝতেন আমরা তা বুঝতে পারি না। আর না বুঝে তাঁর মতানুসারে ফাতওয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (যে বিষয়ে ইমামের দলীল বুঝতে পারি না সে বিষয়ে তাঁর মতের বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রদান করি।)”[3]

আল্লামা ইবন নুজাইম হানাফী (৯২৬-৯৭০ হি) বলেন:

فإن قلت: كيف جاز للمشايخ الإفتاء بغير قول الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون؟ قلت: قد أشكل علي ذلك مدة طويلة ولم أر فيه جواباً إلا ما فهمته الآن من كلامهم، وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام، وكان يفتي بخلاف قوله كثيراً؛ لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به

“যদি প্রশ্ন করেন, মাযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ মুকাল্লিদ ছিলেন, তাঁদের জন্য ইমাম আযমের মত বাদ দিয়ে বিপরীত ফাতওয়া দেওয়া কিভাবে বৈধ হলো? এর উত্তরে আমি বলব: অনেক দিন যাবৎ বিষয়টি আমার মনে খটকা সৃষ্টি করে রেখেছিল। আমি এর কোনো উত্তর পাচ্ছিলাম না। এখন আমি তাঁদের কথা থেকে যা বুঝলাম তার মধ্যে এর উত্তর রয়েছে। তাহলো, তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের সাথীরা (অর্থাৎ ইমামগণ) বলেছেন: “আমরা আমাদের মত কোন্ দলিল থেকে গ্রহণ করেছি সে দলিল না জানা পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া কারো জন্য হালাল নয়।” সিরাজিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ কারণেই ইমাম ইসাম (ইবন ইউসুফ) ইমাম আযমের বিরোধিতা করতেন। তিনি অনেক বিষয়ে ইমাম আযমের মতের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিতেন। কারণ তিনি ইমাম আযমের দলীল জানতে পারেন নি এবং তাঁর কাছে অন্য দলীল জোরালো বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন তিনি উক্ত দলীল অনুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন।”[4]

ইমাম ইসাম এবং তাঁর ভাই ইবরাহীম (২২৯ হি) হানাফী মাযহাবের তৃতীয় প্রজন্মের প্রসিদ্ধতম ইমাম ও ফকীহ। তাঁদের বিষয়ে হানাফী ফকীহগণ লিখেছেন:

كان إبراهيم بن يوسف شيخاً جليلاً فقيهاً، من أصحاب أبي حنيفة... محمد بن داود الفرعي يقول: حلفت أن لا أكتب إلا عن من يقول: الإيمان قول وعمل. فأتيت إبراهيم بن يوسف، فقال: اكتب عني فأني أقول: الإيمان

قول وعمل. وكان عصام بن يوسف، أخو إبراهيم هذا يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع، وكان إبراهيم لا يرفع. وكانا شيخين في زمانهما غير مدافع

ইবরাহীম ইবন ইউসূফ ইমাম আবু হানীফার অনুসারী অত্যন্ত বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ ও শাইখ ছিলেন ... মুহাম্মাদ ইবন দাউদ ফারযী বলেন, আমি কসম করেছিলাম যে, যে ব্যক্তি ঈমান বলতে মুখের স্বীকৃতি ও কর্ম উভয়কেই বুঝায় শুধু তার থেকেই হাদীস শিক্ষা করব। আমি যখন ইবরাহীম ইবন ইউসূফের নিকট আগমন করলাম তখন তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে হাদীস শিখতে পার; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও কর্ম। ইবরাহীম ইবন ইউসূফের ভাই ইসাম ইবন ইউসূফ। ইসাম রুকুতে গমনের সময় এবং রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় হস্তদ্বয় উঠাতেন (রাফউল ইয়াদাইন করতেন), কিন্তু তাঁর ভাই ইবরাহীম তা করতেন না। তাঁরা দুজন তাঁদের যুগের অবিসংবাদিত শাইখ (হানাফী ফকীহ) ছিলেন।”[5]

প্রথম চার বরকতময় যুগের পরে, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজগুলোতে মাযহাব বিষয়ে অনেক গোঁড়ামি জন্ম নেয়। কিন্তু তারপরও অনেক হানাফী ফকীহ ইমাম আযম ও তাঁর ছাত্রদের এ মত অনুসরণ করতে থাকেন এবং সহীহ হাদীসের সাথে ফিকহের সমন্বয়কে গুরুত্ব দিতে থাকেন। ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবন আবিদীন শামী (১২৫২ হি) বলেন:

صَحَّ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَنَظِيرُ هَذَا مَا نَقَلَهُ ... عَنْ شَرْحِ الْهَدَايَةِ لِابْنِ الشَّحْنَةِ، وَنَصُّهُ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَا يَخْرُجُ مُقْلِدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنْفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي.

ইমাম আযম থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন: যখন কোনো হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় তখন সেটিই আমার মাযহাব। এর নমুনা নিম্নরূপ: ... (হিজরী নবম শতকের সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইমাম মুহিববুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মাহমূদ ইবন গাযী হালাবী) ইবন শিহনাহ (৮০৪-৮৯০ হি) হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায় (নিহায়াতুন নিহায়াহ নামক গ্রন্থে) বলেন: “যদি কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় এবং তা মাযহাবের বিপরীত হয় তবে হাদীস অনুসারে কর্ম করতে হবে এবং তা-ই ইমামের মাযহাব বলে গণ্য হবে। সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মাযহাবের বিপরীতে কর্ম করার কারণে মুকাল্লিদের তাকলীদ নষ্ট হবে না এবং তার হানাফী হওয়াও নষ্ট হবে না। কারণ ইমাম থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: যখন কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব বলে গণ্য হবে।”[6]

মুকাল্লিদের জন্য হাদীসের ভিত্তিতে ভিন্নমত অনুসরণ প্রসঙ্গে আল্লামা শামী বলেন:

وَلَا بُعْدَ فِيهِ عِنْدَنَا لِأَنَّ مَا صَحَّ فِيهِ الْخَبَرُ بِلَا مُعَارَضٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يُنْصَرَّ عَلَيْهِ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْعَارِفِ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ كُلِّ مِنَ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

“এরূপ করা আমাদের নিকটও স্বীকৃত। কারণ যদি কোনো হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় এবং তার বিপরীতে কোনো সহীহ হাদীস না থাকে তবে সে হাদীসটিই মুজতাহিদ ইমামের মাযহাব বলে গণ্য, যদিও ইমাম এ বিষয়ে কোনো কিছু না বলে থাকেন। কারণ আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, চার মাযহাবের চার ইমামই বলেছেন: “কোনো হাদীস যখন সহীহ বলে প্রমাণিত হয় তখন সেটিই আমার মাযহাব।” হাফিয ইবন আব্দুল বার এবং শাইখ সূফী শারানী এ বক্তব্য প্রত্যেক ইমাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন।”[7]

অর্থাৎ কোনো মুকাল্লিদ যদি একটি হাদীসকে নিজের অধ্যয়নে সহীহ বলে এবং বিপরীতে সহীহ হাদীস নেই বলে নিশ্চিত হন তবে তিনি উক্ত বিশেষ মাসআলায় সহীহ হাদীস নির্ভর মতটি গ্রহণ করতে পারেন। এরূপ করা তাকলীদের পরিপন্থী নয়।

যেখানে হাদীস নেই, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছেন সেখানেও সাধারণ মানুষের জন্য যে কোনো মত গ্রহণের অবকাশ রয়েছে বলে কোনো কোনো হানাফী ফকীহ উল্লেখ করেছেন। কাযা সালাত আদায় প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন নুজাইম হানাফী (৯৭০ হি) বলেন:

وَإِنْ كَانَ عَامِيًّا لَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ مُّعَيَّنٌ فَمَذْهَبُهُ فِتْوَى مُّفْتِيهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَإِنْ أَفْتَاهُ حَنْفِيٌّ أَعَادَ الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَإِنْ أَفْتَاهُ شَافِعِيٌّ فَلَا يُعِيدُهُمَا وَلَا عِبْرَةَ بَرَأْيِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَفْتِ أَحَدًا وَصَادَفَ الصِّحَّةَ عَلَى مَذْهَبٍ مُّجْتَهِدٍ أَجْزَأُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

“সাধারণ মানুষ, যার কোনো মাযহাব নেই, যে মুফতীকে সে প্রশ্ন করেছে তার মতই তার মাযহাব। হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই যদি কোনো হানাফী ফকীহ তাকে ফাতওয়া দেন তবে তাকে যোহর ও আসরের সালাত পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি কোনো শাফিয়ী ফকীহ তাকে ফাতওয়া দেন তবে তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। এখানে তার নিজের মতের কোনো মূল্য নেই। আর যদি সে কোনো ফকীহের কাছে জিজ্ঞাসা না করে আমল করে এবং তার আমল কোনো একটি মাযহাব অনুসারে সঠিক বলে গণ্য হয় তাহলেও চলবে, তাকে কোনো সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।”[8]

মাযহাব ও হাদীসের সমন্বয়ের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের নির্দেশিত এ ধারা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় সংস্কারক, মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (১১৭৬ হি/১৭৬২খ)। তাঁর বক্তব্য আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবীর (১২৩৯হি) শিষ্য ও খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সূফী সংস্কারক সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১২৪৬হি) এ প্রসঙ্গে বলেন:

“আমলের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলিত চার মাযহাবের অনুসরণ করা খুবই ভাল। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইলমকে এক ব্যক্তির ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না জানা উচিত। বরং তাঁর ইলম সমস্ত জগতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়ের অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট ইলম পৌঁছেছে। যে সময় কিতাবাদি লেখা হয়েছে তখন এ ইলমের সংকলন প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ, সুস্পষ্ট ও গাইর মানসূখ (অ-রহিত) হাদীস পাওয়া যাবে সে মাসআলায় কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করবে না। আহলে হাদীস (মুহাদ্দিসগণ)-কে নিজের নেতা জেনে অন্তর থেকে তাঁদের মহববত করবে। তাঁদের সম্মান করাকে নিজের জন্য জরুরী মনে

করবে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর (ﷺ)-এর ইলম বহনকারী। এভাবে সে তাঁর সাহচর্য লাভ করে তাঁর নিকট মকবুল হয়ে গিয়েছে। আর মুকাল্লিদগণ তো মুজতাহিদের সম্মান ও মর্যাদা ভালরূপেই জানে। তাদের সাবধান করবার প্রয়োজন হয় না।”[9]

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর ছাত্র বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সংস্কারক ও হানারী ফকহী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২৮৯হি/ ১৮৭২খ) বলেন: “মুর্শিদে বরহক হযরত সায়েদ আহমদ (কু. রু)-এর জামানায় দুই প্রকারের লোক ছিল। এক প্রকার যাহারা এলমে হাদীসের শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করাকে অনর্থক মনে করিত এবং উহার কোন মূল্য বুঝিত না। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিল যাহারা ফেকাহর উপর আমল করা এবং নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির অনুসরণ করাকে অস্বীকার করিত এবং এই চার মাযহাবকে বেদআত বলিত। কাজেই উভয় দলকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হইয়াছে যাহাতে উভয় দল মন্দ না বলে এবং নিজেদের বাহুল্য কথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকিদা (বিশ্বাস) অনুযায়ী নিজেদের আকিদাকে ঠিক করিয়া নেয়। এই কথার সমর্থনে আমি (সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী রচিত) ‘সেরাতুল মোস্তাকিম’ কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম হেদায়েতের তৃতীয় ভূমিকার বর্ণনা লিখিয়া দিতেছি, মন দিয়া শোন। ‘শরীয়তের হুকুম আহকাম আমল করিবার মধ্যে চার মাযহাবের অনুকরণ করা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন আছে। কিন্তু ঈমানের মধ্যে তাকলীদ (অন্যের অনুসরণ) জায়েয নয় বরং সৃষ্টিকর্তাকে নিজে বুঝিয়া সুঝিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত। যে নিজে মোজতাহেদ নয় এমন ব্যক্তির আমলের মধ্যে কোন এক মোজতাহেদের কিস্বা নির্দিষ্ট চার মাযহাবের এক মাযহাবের অনুসারী হওয়া জায়েয আছে। তাহারা নিজ নিজ ইমামের মাযহাবের তাকলীদ করিতেছে এবং অন্য ইমামের মাযহাবের তাকলীদকে অস্বীকার করে না এবং এই চার মাযহাব ব্যতীত পঞ্চম মাযহাবকে হক বা সত্য বলিয়া জানে না এবং পঞ্চম মাযহাবের তাকলীদকে জায়েয মনে করে না। মোট কথা, যে মোজতাহেদ নয় তাহার জন্য এইরূপ তাকলীদ ভাল। তাকলীদ আসলে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তাবেদারী, কিন্তু যাহার এজতেহাদ (প্রচেষ্টা) করার ক্ষমতা আছে সে পয়গম্বর (ﷺ)-এর মোজতাহেদগণের মধ্যে শুধু একজনের এলেমের উপর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবে না; কেননা ইহাতে অন্য মাযহাব বাতেল হওয়া বুঝা যায়, যেহেতু এলমে নববী সমস্ত আলেমদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করিয়াছে। সময়ের চাহিদার অনুপাতে প্রত্যেকের নিকট এলেম পৌঁছিয়াছে। যে সময় হুজুর (ﷺ) ‘রফাইয়াদাইন’ করিতেন ঐ সময়ের হাদীস ইমাম শাফী (রহ)-এর নিকট পৌঁছিয়াছে। পরবর্তী সময়ে হাদীসের কিতাবাদি লেখা হইয়াছে এবং উহাতে সমস্ত এলেম একত্রীকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং যে মাসআলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় এবং যাহার অর্থ পরিস্কার বুঝা যায় এবং উহা বিলুপ্তকৃত নয় এবং অন্যের নিকট শোনার প্রয়োজন হয় না, বরং সে নিজেই সহীহ, গায়ের মানসুখ (বিলুপ্তকৃত নয়) ইত্যাদি বুঝিতে পারে, তাহার জন্য সেই মাসআলার ব্যাপারে কাহারো অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। কেননা সেই মাসআলার মধ্যে সে নিজেই মোজতাহেদ। আর মোজতাহেদের জন্য অন্যের অনুকরণ করা জায়েয নয়। এই জামানায় এমন অনেক ব্যক্তি আছে যে আহলে হাদীসকে নিজের নেতা বা পরিচালক বলিয়া মানে এবং মনে প্রাণে তাহার প্রতি মহববত রাখে এবং তাহার সম্মান করাকে জরুরী মনে করে। কেননা এমন ব্যক্তি পয়গম্বর (ﷺ)-এর এলেমের আমলকারী এবং কোন প্রকারে পয়গম্বর (ﷺ)-এর বন্ধুত্ব লাভ করিয়া জনাবে রসূলুল্লাহর (ﷺ) নৈকট্য হাছেল করিতে চায়। আর মোকাল্লিদগণ মোজতাহেদের সম্মান ও মর্যাদা ভালরূপেই জানে। তাহাদের সাবধান করিবার প্রয়োজন হয় না।”[10]

প্রসিদ্ধ হানারী ফকহী আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি) সহীহ হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করাকেই

প্রকৃত তাকলীদ আখ্যায়িত করে বলেন:

طائفة قد تعصبوا في الحنفية تعصبا شديدا والتزموا بما في الفتاوى التزاما سديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا أو أثرا صريحا على خلافه وزعموا أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله الشريفة فترك ما خالف الحديث الصحيح رأي سديد وهو عين تقليد الإمام لا ترك التقليد

“একদল মানুষ হানাফী হওয়ার বিষয়ে প্রচণ্ড গোঁড়ামি করেছেন। সহীহ কোনো হাদীস বা সাহাবী-তাবিয়ীর মত পেলেও তার বিপরীতে ফাতওয়া-মাসাইলে যা পেয়েছেন তা হুবহু অনুসরণ করেছেন। তারা ধারণা করেন যে, এ হাদীস যদি সহীহ হতো তবে মাযহাবের ইমাম তা গ্রহণ করতেন এবং এর বিপরীতে মত দিতেন না। এটি তাদের অজ্ঞতার কারণে। ইমামের কথার উপরে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইমামের নিজের বক্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এরূপ করেছেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ ইমাম আবু হানীফা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সহীহ হাদীস ও আসারকে তাঁর বক্তব্যের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য সহীহ হাদীসের বিপরীত সবকিছু পরিত্যাগ করা সঠিক মত। আর হাদীসের কারণে ইমামের মত পরিত্যাগ করলে তাকলীদ পরিত্যাগ করা হয় না; বরং এরূপ করাই ইমামের প্রকৃত তাকলীদ।”[11]

আব্দুল হাই লাখনবী আরো বলেন:

واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه بل وعن جميع الأئمة في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم. وقال علي القاري... : قال إمامنا الأعظم: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسئلة. وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه الكرام- فضلا عن العوام- أن يعملوا بما صح عن رسول الله ﷺ. وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله ﷺ... فبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيما آخر للمسائل فنقول : الفروع المذكورة في الكتب على طبقات: الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة في الآيات أو السنن النبوية أو الموافقة لإجماع الأمة أو قياسات أئمة الملة من غير أن يظهر على خلافها نص شرعي جلي أو خفي.

والثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية ودلت عليها بعض آيات أو أحاديث نبوية مع ورود بعض آيات دالة على عكسه وأحاديث ناصة على نقضه لكن دخولها في الأصول من طريق أصح وأقوى وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى وحكم هذين القسمين هو القبول كما دل عليه المعقول والمنقول. والثالثة: التي دخلت في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية والحكم فيه لمن أوتي العلم والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة ومن لم يتيسر له ذلك فهو مجاز في ما هنالك. والرابعة:

التي لم يستخرج إلا من القياس وخالفه دليل فوقه غير قابل للاندراس وحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى وهو عين التقليد في صورة ترك التقليد.

والخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي لا كتاب ولا حديث ولا إجماع ولا قياس مجتهد جلي أو خفي لا بالصراحة ولا بالدلالة بل هي من مخترعات المتأخرين الذين يقلدون طرق آبائهم ومشايخهم المتقدمين وحكمه الطرح والجرح فاحفظ هذا التفصيل فإنه قل من اطلع عليه وبإهماله ضل كثير عن سواء السبيل

“জেনে রাখ! ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে, বরং সকল ইমাম থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস তাঁদের মতের বিপরীতে পাওয়া যায় তবে তাঁদের মত বাদ দিতে হবে। মোল্লা আলী কারী বলেন: ‘আমাদের ইমাম আযম বলেছেন: ‘কারো জন্য আমাদের মত গ্রহণ করা বৈধ নয়; যতক্ষণ না সে উক্ত মাসআলাতে আমাদের মতের দলীল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা সুস্পষ্ট কিয়াস থেকে জানতে পারবে।’ ইমাম আযমের এ কথার ভিত্তিতে তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোনো বিষয়ে যদি ইমামের কোনো মত বর্ণিত না থাকে তবে ইমামের অনুসারী মুকাল্লিদ আলিম ও সাধারণ মানুষ সকলের সুনিশ্চিত দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করা। আর যদি ইমাম থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি (তাশাহুদের সময়) ইশারা করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি ইশারা করেছেন, তবে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত মতটিই অগ্রাধিকার লাভ করবে।’... লাখনবী বলেন, উপরের এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আমরা মাযহাবের মাসআলাগুলোকে নিম্নরূপ বিন্যাস করতে পারি। মাযহাবের ফিকহী গ্রন্থগুলিতে সংকলিত মাসআলাগুলো কয়েকটি পর্যায়ের:

ফুটনোট

- [1] কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়াহ ১/৩৪৭।
- [2] ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদিল মুহতার ১/৬৭।
- [3] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/৩৩২।
- [4] ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ৬/২৯৩।
- [5] কুরাশী, তাবাকাতুল হানাফিয়াহ ১/৫২; গাযযী, তারাজিমুল হানাফিয়াহ ১/৭৫।
- [6] ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদিল মুহতার ১/৬৭-৬৮।
- [7] ইবন আবিদীন, হাশিয়াতু রাদিল মুহতার ১/৩৮৫।

[8] ইবন নুজাইম, আল-বাহরুর রায়িক ২/৯০ (৪/৩৮৭); শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ১/৩৩৪।

[9] সেরাতে মুসতাকীম (উর্দু), পৃ. ৭৯।

[10] কারামত আলী জৌনপুরী, কিতাবে এছতেকামাত (বঙ্গানুবাদ), পৃ. ৩৫-৩৭।

[11] আব্দুল হাই লাখনবী, আল-জামি আস-সাগীর, পৃ. ৩৪।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7069>

হাদিসবিডি প্রজেক্টে অনুদান দিন